### সৌজন্য প্রকাশ নিজেকে ছোট করে না

দিন যতই যাচ্ছে করোনা পরিস্থিতি যেন ততই ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, করোনায় আক্রান্ত রোগী ও মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা দিনদিন হু হু করে বেড়ে চলেছে। ওদিকে মানুষও যেন পাল্লা দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করে চলেছে।

করেনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হলেও এর উন্নতির লক্ষণ দেখছি না। ঈদের পর ২৩ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সরকার ঘোষিত কঠোরতম লকডাউনের কথা শোনা গেলেও তিন দিনের মাথায় ঢাকা ও অন্যান্য শহরের যে দৃশ্য দেখা গেছে, তাতে মনে হচ্ছে সরকার বরাবরের মতো কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দিয়ে শৈথিল্যের পথেই পা বাড়িয়েছে।

ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। করোনায় শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ও মৃত্যুর হার আগের সব রেকর্ডকে ভঙ্গ করেছে। ২৭ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ঘোষণা অনুযায়ী আগের দিনের অর্থাৎ বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৫৮ জনের এবং শনাক্তের সংখ্যা পনেরো হাজারের মধ্যে ওঠানামা করছে।

করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা অনেকগুলো করণীয় বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয়ে বেশ গুরুত্ব দিয়ে সেগুলো প্রতিপালনের আহ্বান জানিয়ে আসছেন; এগুলো হলো-সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরিধান করা এবং টিকা গ্রহণ করা। এখন একথা বলাই যায়, এই তিন বিষয়েই ব্যক্তি পর্যায় থেকে সরকারি পর্যায় পর্যন্ত আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলা দেখিয়ে এসেছি।

বিশেষ করে নাগরিক হিসাবে প্রথম দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিপালন করা আমাদের সবারই দায়িত্ব। তবে টিকাদান কর্মসূচির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কোনো হাত নেই। এটি সরকার এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু টিকা আমদানির বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রথম থেকেই যে ভ্রান্তপথে চলেছিল তাতে টিকাদান কর্মসূচিই স্থবির হয়ে পড়েছিল।

এ নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। তাদের সেই ভুলের মাসুল হিসাবে দেশের প্রায় ১৫ লাখ মানুষ টিকার প্রথম ডোজ নিয়ে আজও দ্বিতীয় ডোজের অপেক্ষায় আছেন। ভারত অগ্রিম টাকা নিয়েও টিকা সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় সরকার অন্যান্য উৎস থেকে টিকা পাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে সময় অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই কিছু করতে পারছিল না। সরকারের পাশাপাশি প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিরাও তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাংলাদেশের জন্য টিকা সংগ্রহের প্রাণান্ত চেষ্টা করে গেছেন।

এরই মধ্যে আমরা যেন আশার আলো দেখতে পেলাম। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ব্যক্তি আমাদের সেই আশার আলো দেখিয়েছেন। তারা হলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত কার্ডিওলজিস্ট অধ্যাপক ডা. মাসুদুল হাসান, নেফ্রোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ সাদেক, কার্ডিওলজিস্ট ডা. চৌধুরী হাফিজ আহসান, জাতিসংঘের সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তা মাহমুদ উস শামস চৌধুরী এবং কানাডায় বসবাসরত ডা. আরিফুর রহমান।

তারা প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে বাংলাদেশের প্রতি তাদের অকৃত্রিম দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেছেন। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে সরকারি পর্যায়ে অনেক চেষ্টা করেও যখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে টিকা পাবে এমন দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারছিলেন না, তখন তারই অনুরোধে দেশপ্রেমিক এই চিকিৎসকরা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্লোবাল এক্সেস বা কোভ্যাক্স সদস্য ১৮১টি দেশের মধ্যে মাত্র ১৮টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন এবং বিনামূল্যে দেশে এ পর্যন্ত এক লাখ ছয় হাজার ডোজ ফাইজার ও ৫৫ লাখ ডোজ মডার্নার টিকা বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন। তারা এমনও ব্যবস্থা করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র কোভ্যাক্সের আওতায় যতবার টিকা দেবে, ততবারই বাংলাদেশ পাবে। টিকার এই সংকট মুহূর্তে এ প্রাপ্তি দেশের মানুষের জন্য যে বড় স্বস্তির কারণ, তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশি চিকিৎসকরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে যখন টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন কিন্তু তখনো বাংলাদেশে প্রেরণ করতে পারেননি, ঠিক সে সময় থেকেই আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী একাধিকবার বিবৃতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে টিকা আসছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করেছি, মাননীয় মন্ত্রীরা তাদের কোনো বক্তব্যেই এই টিকা পাঠানোর মূল নায়কদের কথা একবারের জন্যও উচ্চারণ করলেন না! বরং তারা এমনভাবে বক্তব্য দিয়েছিলেন যা শুনে বোঝার উপায় ছিল না মূলত কাদের প্রচেষ্টায় এই টিকাগুলো বাংলাদেশে এসেছে! বাংলাদেশি চিকিৎসকরা টিকা পাঠিয়েই বসে থাকেননি। তারা দুই কিস্তিতে মোট ৩৭৭টি পোর্টেবল ভেন্টিলেটরও পাঠিয়েছেন যার প্রতিটির মূল্য ১৫০০০ ডলার।

সে হিসাবে ভেন্টিলেটরগুলোর মূল্য গিয়ে দাঁড়ায় ৫৬ লাখ ৫৫ হাজার মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় অর্ধ শতকোটি টাকার সমান! এই ৩৭৭টি ভেন্টিলেটরের মধ্যে ১২৭টি বারডেমের জন্য এবং ২৫০টি দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে।

গত ২৪ জুলাই ২৫০টি ভেন্টিলেটর বাংলাদেশে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এবিএম আবদুল্লাহ্ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিমানবন্দরে ভেন্টিলেটরগুলো যখন গ্রহণ করেন, তখন দেশবাসী মিডিয়ার বদৌলতে একযোগে নেপথ্য নায়কদের কথা জানতে পারে।

অথচ এক সপ্তাহ আগেই বারডেমের জন্য যে ১২৭টি পোর্টেবল ভেন্টিলেটর পাঠিয়েছিলেন সে খবর কিন্তু মিডিয়ায় সম্পূর্ণ উহ্য রয়ে গেছে। ভেন্টিলেটরের স্বল্পতার জন্য চিকিৎসাসেবায় যে সমস্যা হচ্ছে, সে খবর আমরা আগেই জানি। দেশে বর্তমানে মাত্র ৬৬০টি ভেন্টিলেটর আছে, এর মধ্যে আবার ২৩টিই অকেজো। এই আকালের দিনে বিনামূল্যে ৩৭৭টি ভেন্টিলেটর পাওয়া যেন হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, দায়িত্বপূর্ণ পদে বসে আমরা প্রায়ই মুরব্বিদের একটি উপদেশবাণীর কথা ভুলে যাই। আমার বিশ্বাস বাল্যকালে সব পিতা-মাতাই তাদের সন্তানদের এই উপদেশটি শিখিয়ে থাকেন। উপদেশটি হলো, উপকারীর উপকার স্বীকার করা সৌজন্যেরই অংশ, আর সৌজন্য প্রকাশে নিজেকে ছোট করা হয় না।’ একটি কথা বলতেই হয়, সৌজন্য প্রকাশের মাঝে যে সৌন্দর্য আছে তা যতদিন না একজন উপভোগ করতে পারবেন, ততদিন তিনি নিজ পদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেন না।

যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী এই বিশিষ্ট বাংলাদেশিরা জাতির এই ক্রান্তিকালে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, সে জন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। টেলিভিশনে করোনাসংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডা. মাসুদকে দেশের প্রতি তাদের কমিটমেন্টের কথা প্রায়ই বলতে শুনি। নিজেকে শহিদ পরিবারের সন্তান হিসাবে পরিচয় দিতে গিয়ে প্রায়ই আবেগপ্রবণ হতে দেখেছি তাকে।

এই আবেগপ্রবণ হওয়ার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডা. মাসুদের সঙ্গে কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার ও ডা. জিয়ার পিতার শহিদ হওয়ার যে কাহিনি জেনেছি তা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। ১৯৭১ সালে ডা. মাসুদ ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। তার পিতা শহিদ ডা. আশরাফ আলী তালুকদার চট্টগ্রাম পুলিশ হাসপাতালের চিফ মেডিকেল অফিসার ছিলেন।

মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ডা. মাসুদ চট্টগ্রামে চলে যান। ২৫ মার্চের পর চট্টগ্রামে পাকিস্তানিদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রচুর আহত বাঙালি যোদ্ধাদের ডা. আশরাফ চিকিৎসা করেছেন। এমনকি ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে তার সরকারি বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকাও উড়িয়েছেন তিনি। পতাকা উত্তোলনের এই বিষয় কর্তৃপক্ষ ভালো চোখে দেখেনি। ২৯ মার্চ পাকিস্তানিদের হাতে চট্টগ্রাম শহরের পতন হলে ডা. আশরাফ পরিবারসহ মেহেদিবাগে এক নিকট আত্মীয়ের বাসায় আত্মগোপন করেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, ১৫ এপ্রিল পাক সেনারা মেহেদিবাগের সেই বাসা ঘেরাও করে ডা. আশরাফকে তার পুত্র ডা. মাসুদসহ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ধরে নিয়ে যায়। অতঃপর চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ফায়ারিং রেঞ্জে দাঁড় করিয়ে পিতা ও পুত্র উভয়কে সাব-মেশিনগান দিয়ে ব্রাশফায়ার করে।

গুলি গিয়ে আঘাত করে ডা. আশরাফের চোখে, বুকে ও পেটে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শহিদ হন। অপরদিকে ডা. মাসুদের শরীরের বাম পাশে ১৮টি গুলি আঘাত করে। ফলে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুলিবর্ষণের পর বেয়নেট চার্জ করলেও ডা. মাসুদ সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। পাকিস্তানিরা চলে গেলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর পরিচিত চিকিৎসকদের সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে ভালো হয়ে ওঠেন।

পরে ১৯৭২ সালে উন্নতর চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডা. মাসুদকে মস্কো প্রেরণ করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা শুনে মনে মনে ভেবেছি, মুক্তিযুদ্ধে তিনি ও তার পরিবার এতবড় আত্মত্যাগ করতে পেরেছিল বলেই ১৮টি বুলেট ইনজুরি নিয়ে ডা. মাসুদ আজও দেশের প্রয়োজনে এভাবে এগিয়ে আসেন এবং কথা বলার সময় অন্যদের মতো কথার ফুলঝুরি না ফুটিয়ে এমন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ সাদেকের পিতা শহিদ ডা. শামসুদ্দিনকেও ১৯৭১ সালের এপ্রিলেই হত্যা করা হয়। তিনি তখন সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রধান ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে ডা. শামসুদ্দিন আহত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষের চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল টিম গঠন করেন। এই টিমের প্রধান ছিলেন তিনি নিজেই। বিভিন্ন সংঘর্ষে পাকিস্তানিদের গুলিতে ও নির্যাতনে আহত প্রায় দুই শতাধিক মানুষকে তিনি চিকিৎসা দেন।

৯ এপ্রিল পাকিস্তানিদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে কয়েকজন গুলিবিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাকে সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে ডা. শামসুদ্দিন অপারেশন থিয়েটারে তার টিমের সদস্যদের নিয়ে অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় বেলা ১১টার দিকে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর সদস্যরা হাসপাতাল ঘেরাও করে অপারেশন থিয়েটার থেকে ডা. শামসুদ্দিন ও তার টিমের সদস্যদের টেনেহিঁচড়ে বের করে হাসাপাতালের সীমানা প্রাচীরের কাছে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। হায়নাদের গুলি গিয়ে আঘাত করে ডা. শামসুদ্দিনের পেটে ও বুকের ডান ও বাম পাশে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তিনি শহিদ হন।

সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি বর্তমানে শহিদ ডা. শামসুদ্দিনের নামে নামকরণ করা হয়েছে। ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ সাদেক শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. শামসুদ্দিনেরই সুযোগ্য পুত্র। কাজেই অন্য অনেকের মতো মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের প্রতি লোকদেখানো দরদ না দেখিয়ে খাঁটি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের এই কঠিন সময়ে প্রকৃত যোদ্ধার মতো তিনিও এগিয়ে এসেছেন।

করোনার এই মহাসংকটকালে সরকারও সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সবাইকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। প্রতিশ্রুতি যদি ঠিক থাকে, তাহলে এ বছরের শেষ নাগাদ চীন থেকে তিন কোটি, রাশিয়া থেকে সাত কোটি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে জনসন অ্যান্ড জনসনের সাত কোটি এবং বিভিন্ন উৎস থেকে আরও তিন কোটি অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা দেশে পৌঁছানোর কথা। আশা করি সরকারের সংশ্লিষ্টরা সে লক্ষ্যে সৎ ও আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

লেখাটি শেষ করার আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি আক্ষেপের কথা উল্লেখ করে শেষ করতে চাই। তিনি ২৪ এপ্রিল এক ভার্চুয়াল সভায় বলেছেন, ‘প্রতিটি দেশেই নিজের দেশের স্বাস্থ্য খাত নিয়ে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, প্রশংসা হচ্ছে। শুধু আমাদের দেশেই এই মহামারির সময়েও দেশের স্বাস্থ্য খাত নিয়ে সমালোচনা করে চিকিৎসক, নার্সদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে বিশেষ কিছু মহল, যা মোটেও কাম্য নয়।’

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের সঙ্গে একটু দ্বিমত পোষণ করে সবিনয়ে বলতে চাই, চিকিৎসা খাত বলতে তিনি কি শুধু চিকিৎসক আর নার্সদেরই বুঝিয়েছেন? নাকি এ খাতে আরও যে অনেকেই জড়িত আছেন, যাদের চারিত্রিক স্খলনজনিত দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে দেশে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে, তাদেরও বুঝিয়েছেন?

করোনাযুদ্ধের ফ্রন্ট লাইনের যে যোদ্ধা চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসাকর্মীরা রাতদিন নিরলস চিকিৎসাসেবা দিয়ে ইতোমধ্যেই সবার মনে জায়গা করে নিয়েছেন, মানুষ কেন তাদের মনোবল ভাঙতে যাবে? বরং দেশের সাধারণ মানুষ এসব সম্মুখসারির যোদ্ধাদের ক্লান্তিহীন নিরন্তর মানবসেবায় মুগ্ধ হয়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করছে।